পাত্রী দেখার আড়ালে এক নীরব জুলুম

সামাজিক সচেতনতা ও শরয়ি দৃষ্টিকোণ সংক্রান্ত বিশেষ সংকলন

✍️ সাকিব মাহবুব

✍️ মাওলানা খাইরুল ইসলাম

✍️ সাকিব মাহবুব

বিয়ের আগে প্রায় দুই বছর ধরে বিভিন্নভাবে নিজের জন্য পাত্রী দেখা হয়েছিল। এই সময়ে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে, তিক্ত কিছু বিষয়ও সামনে এসেছে। একসময় এতটাই নিরাশ হয়ে গিয়েছিলাম যে মনে হয়েছিল, হয়তো আর ভালো কিছু হবে না। তবুও এই দীর্ঘ সময়ে আমি একটি সিদ্ধান্ত থেকে কখনো সরে আসিনি– কোনো মেয়েকে অযথা সরাসরি গিয়ে না দেখা। মাহরামের মাধ্যমে ছবি দেখেছি, প্রয়োজনীয় তথ্য জেনেছি। সর্বশেষ সবকিছু যাচাই-বাছাই করে যখন সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত, তখনই একজনকে সরাসরি দেখতে গিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, তাকেই বিয়ে করেছি।

কেনো আমি একাধিক জায়গায় গিয়ে পাত্রী দেখিনি? সেই প্রশ্নের উত্তরই মূলত এই আলোচনার ভিত্তি।

ভূমিকা না বাড়িয়ে মূল কথায় আসি। লেখাটি কিছুটা দীর্ঘ হলেও অনুরোধ থাকবে, ধৈর্য নিয়ে পড়ার। লাইক, কমেন্ট কিংবা ক্রেডিট দেওয়ারও দরকার নেই। তবে প্রচুর মানুষের কাছে এই আলোচনাটা পৌঁছানো চাই। তাই কেউ চাইলে শেয়ার করুন, কেউ কপি-পেস্ট করুন। উদ্দেশ্য একটাই—একটি প্রয়োজনীয় সচেতনতার কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এর উত্তম প্রতিদান আপনিও পাবেন ইনশাআল্লাহ।

সামাজিক অন্যায়ের রূপ ও বিস্তার

পাত্রী দেখার ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে পাত্রপক্ষ এমন একটি অন্যায়ের চর্চা করে আসছে, যা ধীরে ধীরে রীতির মর্যাদা পেয়ে গেছে। বিস্ময়ের বিষয় হলো, অধিকাংশ মানুষ এটিকে অন্যায় বলেও মনে করেন না। অথচ সামান্য নিরপেক্ষভাবে ভেবে দেখলেই বুঝে আসে, এটি কেবল একটি সামাজিক রীতি নয়; বহু ক্ষেত্রে এটি নীরব জুলুম।

পাত্রী দেখার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়ম কী হওয়া উচিত?

প্রথমে মেয়ের দ্বীনদারিতা, চরিত্র, পরিবার, মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন—সবকিছু সম্পর্কে নির্ভরযোগ্যভাবে খোঁজ নেওয়া। প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শেষে যদি মনে হয় বিষয়টি সামনে এগোনোর মতো, তাহলে পরিবারের মহিলা সদস্যদের মধ্যে এক দু'জন গিয়ে মেয়েকে দেখে আসবেন। এরপর সবকিছু ইতিবাচক থাকলে ছেলেও যাবে। আর তারও আগে মেয়েপক্ষ ছেলের সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে, বুঝে, আগ্রহ প্রকাশ করবে। অর্থাৎ উভয় পক্ষই যথাসম্ভব নিশ্চিত হওয়ার পরই সরাসরি সাক্ষাতের পর্যায়ে যাবে।

বাস্তবতার চিত্র

কিন্তু বাস্তবে কী হয়? কোনোভাবে একটি সম্বন্ধের সন্ধান পাওয়া মাত্রই আর সাত-পাঁচ ভাবার সময় ও ধৈর্য হাতে থাকে না। যেন একটু দেরি হলেই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। তড়িঘড়ি করে পাত্রী দেখার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে যায়। তারপর একদিনের মধ্যেই মা-বাবা, ছেলে, বড় ভাই, বড় বোন, দুলাভাই, চাচা—কখনো কখনো আত্মীয়স্বজনের পুরো বহর গিয়ে উপস্থিত হয় মেয়ের দরজায়।

এরপর শুরু হয় আপ্যায়নের পালা। অনেক পরিবার সামর্থ্যের সীমা অতিক্রম করেও অতিথিপরায়ণতার দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য হয়। অর্থ ব্যয় হয়, শ্রম ব্যয় হয়; তার চেয়েও বেশি ক্ষয় হয় মানসিক স্বস্তির। সব আয়োজন শেষে পাত্রপক্ষ দেখে-শুনে বিদায় নেয়।

তারপর... নেমে আসে এক অদ্ভুত নীরবতা। আর কোনো খবর নেই। এক সপ্তাহ পেরিয়ে যায়। এক মাস কেটে যায়। কখনো তারও বেশি সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু অপেক্ষার প্রহর আর ফুরায় না।

মেয়ের পরিবার অপেক্ষা করে। মেয়েটি নীরবে অপেক্ষা করে। আশা নিয়ে, স্বপ্ন নিয়ে দিন গোনে। অথচ এদিকে পাত্রপক্ষ আরও তিন-চারটি জায়গা দেখে ফেলেছে। প্রথম মেয়েটির কথা তাদের মনেই নেই।

> **এটাকে কি অবিচার বলা হবে না? এটাকে কি অমানবিক আচরণ বলা হবে না? এটাকে কি এক ধরনের নীরব জুলুম বললেও অত্যুক্তি হবে?**

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, ছেলেপক্ষ অধিকাংশ সময় এই জুলুমের গভীরতাই উপলব্ধি করতে পারে না। করবেই-বা কীভাবে? একজন ছেলে একশোটি মেয়েকে দেখেও ফিরে এলে তার সামাজিক অবস্থানেও

তেমন কোনো প্রভাব পড়ে না, মানসিক অশান্তিরও তেমন কিছু হয় না। বরং দুঃখজনক হলেও সত্য, কেউ কেউ এটিকে এক ধরনের আনন্দ কিংবা সামাজিক রেওয়াজ বলেই ধরে নিয়েছেন।

কিন্তু একটি মেয়ের জীবনে বিষয়টি এতটা হালকা নয়। তার পরিবার জানে প্রতিটি অপেক্ষার প্রহর কতটা ভারী। সে নিজে জানে অনিশ্চয়তার প্রতিটি দিন কত দীর্ঘ, কত ক্লান্তিকর, কত অস্থিরতায় ভরা। আপনি হয়তো কয়েক ঘণ্টার জন্য দলবল নিয়ে গিয়ে দেখে এলেন। কিন্তু সেই কয়েক ঘণ্টার পদচিহ্ন একটি মেয়ে ও তার পরিবারের মনে কত দিন পর্যন্ত রয়ে যায়, কখনো কি তা ভেবে দেখেছেন?

যখন আশপাশের মানুষ জানতে পারে, এতজন মানুষ এসে দেখে গেলো, তখন পরবর্তী প্রতিটি প্রস্তাবের সঙ্গে অবধারিতভাবেই কিছু প্রশ্নও এসে দাঁড়ায়— কেন হলো না? কেন অপছন্দ হলো? মেয়ের কোনো সমস্যা ছিল? নাকি পরিবারের? তখন পরিবার ও মেয়ে অগত্যা এমন এক বিব্রতকর ও হতাশাজনক পরিস্থিতিতে পড়ে, যার ভার বাইরের মানুষ কখনো উপলব্ধিই করতে পারে না।

আর যদি এরই মধ্যে ছেলেটি কিংবা তার পরিবার মেয়েটির মনে গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে থাকে, তাহলে সেই অপেক্ষা, সেই অপূর্ণ প্রত্যাশা, সেই নীরব ভাঙন তার অন্তরে এমন এক ক্ষতের জন্ম দেয়, যার গভীরতা বাইরে থেকে কখনোই বোঝা যায় না। মানুষ দেখে একটি সম্বন্ধ ভেঙে গেছে; কিন্তু দেখতে পায় না, সেই সঙ্গে একটি কোমল হৃদয়ের কতগুলো স্বপ্নও নীরবে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। সেই অভিঘাতের রেশ অনেক সময় দীর্ঘদিন, কখনো দীর্ঘকাল পর্যন্ত একজন মেয়ে এবং তার পরিবারের ভেতরে থেকে যায়।

একটি পরিবারের সবাই কি একসঙ্গে এতটাই অবুঝ হয়ে যেতে পারে? সবাই কি এতটাই অসচেতন হতে পারে? ছোটদের কথা না হয় বাদই দিলাম। আবেগের বয়সে তারা অনেক কিছু ভেবে ওঠে না, অনেক কিছুই বিবেচনায় আসে না। কিন্তু পরিবারের প্রবীণরা? তাদের তো অভিজ্ঞতা পোক্ত, তারাও কিভাবে একটি মেয়ে ও তার পরিবারের উপর এমন মানসিক চাপ সৃষ্টি করার আগে একবারও ভাবেন না?

মানুষের কষ্টকে হালকাভাবে নেওয়ার ফল কখনোই ভালো হয় না। কারও হৃদয়ে অকারণে কষ্ট দেওয়া, কারও আশা ভেঙে দেওয়া, কাউকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা— এসব যদি সত্যিকার অর্থেই জুলুম হয়ে থাকে, তবে এর প্রতিক্রিয়া যে একেবারেই হবে না—এ কথা বলার সুযোগ নেই।

উপসংহার ও আহ্বান

যাচাই-বাছাই না করে, যথেষ্ট নিশ্চিত না হয়ে, অযথা একটি মেয়ে ও তার পরিবারের মনে আশা জাগিয়ে তাদের দীর্ঘ অপেক্ষা, মানসিক কষ্ট ও অনিশ্চয়তার কারণ না হই। একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার

আমাদের অবশ্যই আছে; কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের পথে যেন অন্য একটি পরিবারকে অকারণে কষ্টের ভার বহন করতে না হয়—এই বিবেকটুকুও আমাদের থাকা উচিত।

নিজে সচেতন হই, অন্যদেরও সচেতন করি। হয়তো আমাদের এই সামান্য পরিবর্তনই একটি পরিবারের অশ্রু বাঁচাবে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটাবে, আর একটি মেয়ের হৃদয়ে অকারণে জন্ম নেওয়া ভাঙা স্বপ্নের দায় থেকে আমাদের মুক্ত রাখবে। মনে রাখবেন, একটি সচেতনতা হতে পারে আপনার জীবনের বড় পরিবর্তনের সূচনা।

✍️ মাওলানা খাইরুল ইসলাম

বিয়েতে পাত্রপক্ষকে পাত্রীর ছবি দেওয়া যাবে?

বর্তমানে বিয়ের বায়োডাটার সঙ্গে পাত্রীর ছবি সংযুক্ত করার প্রচলন ব্যাপকভাবে বেড়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে পর্দা, হায়া ও শরয়ি সীমারেখার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

যদি পাত্রপক্ষ বিশেষভাবে পাত্রীর খোলা মুখের বা পর্দা ছাড়া ছবি দেখতে চায়, তাহলে শুধু বিবাহেচ্ছু পাত্রকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সীমিতভাবে সেই ছবি দেখানোর অবকাশ থাকতে পারে। কারণ শরীয়তে বিয়ের উদ্দেশ্যে পাত্রের জন্য পাত্রীকে দেখার অনুমতি রয়েছে। তবে এ অনুমতি প্রয়োজন ও সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

এ ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল রাখা জরুরি—

1. **প্রথমত:** পাত্র নিজে ছবি দেখতে পারবে; কিন্তু পরিবারের অন্য কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষ, আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবদের সেই ছবি দেখানো জায়েয নয়। কারণ তারা সকলেই পাত্রীর জন্য গায়রে মাহরাম।

2. **দ্বিতীয়ত:** যদি প্রবল আশঙ্কা থাকে যে, পাত্র ছবি দেখার পর তা অন্যদের দেখাবে, সংরক্ষণ করবে বা অপব্যবহার করবে, তাহলে এমন পাত্রপক্ষকে ছবি দেওয়া বৈধ হবে না। কারণ এতে পর্দার বিধান লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

3. **তৃতীয়ত:** বিয়ের আলোচনা চূড়ান্ত না হলে বা কোনো কারণে বিয়ে ভেঙে গেলে ছবির অপব্যবহারের ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়। তাই যদি আশঙ্কা থাকে যে, পাত্র পরে সেই ছবি নিজের কাছে রেখে দেবে, বারবার দেখবে বা অন্যকে দেখাবে, তাহলে শুরু থেকেই ছবি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

4. **চতুর্থত:** যদি পাত্র ও তার পরিবার দ্বীনদার, আমানতদার ও শরয়ি সীমারেখার ব্যাপারে সচেতন হন এবং তাদের ব্যাপারে জোরালো সুধারণা থাকে, তাহলে সীমিতভাবে ছবি দেখানোর অবকাশ আছে। তবে সে ক্ষেত্রেও তাদের কাছ থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নেওয়া উচিত যে, ছবি অন্য কাউকে দেখানো হবে না এবং দেখার পর তা ডিলিট বা মুছে ফেলা হবে।

সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি হলো— সরাসরি সাক্ষাতের শরয়ি ব্যবস্থা করা অথবা প্রয়োজনে শুধু পাত্রকে সীমিতভাবে ছবি দেখিয়ে পরে তা ফিরিয়ে নেওয়া বা মুছে ফেলা। কারণ ছবি একবার ছড়িয়ে পড়লে তার অপব্যবহার ঠেকানো অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়।

অতএব, এ বিষয়ে আবেগ বা সামাজিক প্রচলনের অনুসরণ নয়; বরং পর্দা, হায়া ও দ্বীনি দায়িত্ববোধকে অগ্রাধিকার দিয়ে সতর্ক ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

বইঃ প্রকাশিতব্য ‘সতীত্ব ও পর্দা মুসলিম নারীর অহংকার’